বিপণন পরিবেশ, তথ্য সংগ্রহ ও চাহিদার পূর্বপরিকল্পনা

Marketing Enviornment, Collecting Information and Demand Forecasting

৩

বিপণনের কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য বিপণন তথ্য ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে। এর মাধ্যমে বিপণনকারী পর্যাপ্ত তথ্য ব্যবহার করে সঠিক সময়ে যথোপযুক্ত, দ্রুত ও কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক ও পরিবর্তিত বাজার পরিবেশে বাজার তথ্য একটি অন্যতম গুরত্বপূর্ণ বিষয়। প্রতিষ্ঠানের বাইরের বিভিন্ন বিষয়াদি- বাজারে কি ঘটছে, কি ঘটতে পারে, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ চাহিদা ও সরবরাহের অবস্থা, মূল্য পরিস্থিতি, প্রতিযোগিতা, ভোক্তার রুচি, পছন্দ ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য বিপণনকারীর জন্য জানা অত্যন্ত প্রয়োজন। এরসাথে প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন বিভাগ ও তার কার্যক্রমের তথ্যও বিপণনকারীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এই ইউনিটের প্রথম পাঠে বিপণন পরিবেশ কী, বাহ্যিক ও সামষ্টিক পরিবেশের উপাদান সম্পর্কে বিবরণ দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় পাঠে বিপণন তথ্য ব্যবস্থা কী বিবরণ দেওয়া হয়েছে, যেখানে অভ্যন্তরিণ তথ্য, বিপণন বুদ্ধিমত্তা ও বিপণন গবেষণা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় পাঠে সামষ্টিক পরিবেশ বিশ্লেষণ নিয়ে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সর্বশেষে, চতুর্থ পাঠে এইসব তথ্য ব্যবহার করে বর্তমান ও ভবিষ্যত চাহিদা নির্ধারণের পদ্ধতিসমূহ আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় দুই সপ্তাহ

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ৩.১ : বিপণন পরিবেশ: ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক
পাঠ - ৩.২ : বিপণন তথ্য ব্যবস্থা
পাঠ - ৩.৩ : সামষ্টিক পরিবেশ বিশ্লেষণ
পাঠ - ৩.৪ : বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদা নির্ধারণ

পাঠ-৩.১ বিপণন পরিবেশ: ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক
Marketing Environment: Micro and Macro

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বিপণন পরিবেশ কী জানতে পারবেন;
- ব্যষ্টিক বিপণন পরিবেশ সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন এবং
- সামষ্টিক বিপণন পরিবেশের বর্ণনা করতে পারবেন।

ব্যবসায় পরিবেশের পরিবর্তন বিপণনকারীর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কারণ বাজারের প্রবণতা অনুসরণ এবং সুযোগ অনুসন্ধান করে তাকে পরিকল্পনা ও কৌশল নির্ধারণ করতে হয়। বিপণন গোয়েন্দা ব্যবস্থা এবং বিপণন গবেষণার মাধ্যমে বিপণনকারী ব্যবসায় পরিবেশের তথ্য সংগ্রহের কাজ করে থাকে। পরিবেশ স্ক্যানিং করে বিপণনকারী বাজারে সৃষ্ট নতুন হুমকি ও সুযোগ সম্পর্কে জানতে পারে এবং উপযুক্ত বিপণন কৌশল গ্রহণ করতে পারে।

বিপণন পরিবেশ
Marketing Environment

নির্দিষ্ট কোনো পণ্য বা সেবা বিপণনে যে সমস্ত বিষয়, পক্ষ বা শক্তিসমূহ পণ্য বা সেবার ওপর প্রভাব বিস্তার করে, তাই হলো পণ্যের বিপণন পরিবেশ। কোনো একটি পণ্য বা সেবা বিপণন করতে গেলে যে সমস্ত নিয়ন্ত্রিত ও অনিয়ন্ত্রিত উপাদান বা শক্তি প্রভাব বিস্তার করতে পারে, তাদের সমষ্টিকে বিপণন পরিবেশ বলে। Philip Kotler and Gary Armstrong বিপণন পরিবেশ সম্পর্কে বলেছেন, "বিপণন পরিবেশ হলো বিপণন-বহির্ভূত কতগুলো পক্ষ বা শক্তির সমষ্টি যা অভীষ্ট ক্রেতার সাথে সফল সম্পর্ক তৈরি ও বজায় রাখার ক্ষেত্রে বিপণন ব্যবস্থাপনার সামর্থ্যকে প্রভাবিত করে।" ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক দুই ধরনের উপাদান নিয়ে বিপণন পরিবেশ গঠিত। তা নিম্নে আলোচনা করা হলো-

চিত্র ৩.১ : সামগ্রিক বিপণন পরিবেশ

ক) ব্যষ্টিক বিপণন পরিবেশ
Micro-Marketing Environment

কোনো পণ্য, সেবা বা ধারণা বিপণনে প্রতিষ্ঠানের ভিতরকার বা খুব কাছাকাছি এমন শক্তিগুলো নিয়ে ব্যষ্টিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়। যার মধ্যে রয়েছে কোম্পানি, সরবরাহকারী, মধ্যস্থব্যবসায়ী, ক্রেতা, প্রতিযোগী এবং জনগোষ্ঠী। এ পরিবেশের উপাদানগুলো প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে সরাসরি প্রভাব বিস্তার করে এবং প্রতিষ্ঠান এ উপাদানগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ব্যষ্টিক পরিবেশের উপাদানগুলো হলো-

১. **কোম্পানি (Company):** কোম্পানি হচ্ছে আইনের দ্বারা গঠিত সংস্থা, যেখানে কতিপয় সদস্য মিলিত হয়ে বিপণন কার্যক্রম সম্পাদনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে।

বিপণন পরিকল্পনা তৈরির সময় প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরিণ অন্যান্য বিভাগ যেমন- উচ্চতর ব্যবস্থাপনা, অর্থ, হিসাব বিভাগ, গবেষণা ও উন্নয়ন, উৎপাদন, ক্রয় বিভাগ এবং বিক্রয় বিভাগ ইত্যাদি বিভাগকে বিবেচনায় রাখা হয়। এসকল বিভাগের কার্যকর সমন্বয়ের মাধ্যমে বিপণন পরিকল্পনার বাস্তব রূপ দেওয়া সম্ভব হয়।

২. **সরবরাহকারী (Suppliers):** সরবরাহকারী হচ্ছে সেসকল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যারা প্রতিষ্ঠানের পণ্য ও সেবা উৎপাদনে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের যোগান দেয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে বাইসাইকেল উৎপাদনকারী কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে উৎপাদনের জন্য স্টিল, এ্যালুমিনিয়াম, রাবার সিট এবং অন্যান্য কাঁচামাল জোগাড় করতে হয়। এছাড়ও শ্রমিক, যন্ত্রপাতি, জ্বালানি, বিদ্যুৎ, কম্পিউটার এবং অন্যান্য উপকরণের প্রয়োজন হয়। সরবরাহকারী এসব কাঁচামাল পর্যাপ্ত পরিমাণে সঠিক সময়ে সরবরাহ করে পণ্য উৎপাদনে সহায়তা করে। সরবরাহকারীর সাথে বিপণনকারী সবসময় সুসম্পর্ক রাখে কারণ সরবরাহের ঘাটতি বা দেরির জন্য বিক্রয়ের ওপর প্রভাব পড়বে। ফলশ্রুতিতে দীর্ঘমেয়াদে ক্রেতার সন্তুষ্টি অর্জন বাধাগ্রস্থ হবে।

৩. **মধ্যস্থ ব্যবসায়ী (Intermediaries):** যে সকল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সাহায্যে বিপণনকারী তার উৎপাদিত চূড়ান্ত পণ্য ক্রেতার নিকট বিক্রয় এবং বণ্টন করে তাদেরকে বিপণন মধ্যস্থতাকারবারী বলে। এদের মধ্যে রয়েছে পাইকারি ও খুচরা বিক্রেতা, প্রতিনিধি, সেবা সংস্থা, কমিশন মার্চেন্ট, আর্থিক মধ্যস্থতাকারবারি।

৪. **ক্রেতা (Customers):** যে সকল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান পণ্য বা সেবা ক্রয় করে তাদেরকে ক্রেতা বলে। আর একই ধরনের পণ্যের ক্রেতাসমগ্র নিয়ে সেই পণ্যের বাজার সৃষ্টি হয়। সাধারণত পাঁচ ধরনের ক্রেতা রয়েছে। তারা হলো- ভোক্তা বাজার, শিল্প বাজার, পুনঃবিক্রেতার বাজার, সরকারি বাজার, এবং আন্তর্জাতিক বাজার। ক্রেতা ভ্যালু সৃষ্টি ও ক্রেতাদেরকে ধরে রাখার জন্য বিপণনকারী বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে।

৫. **প্রতিযোগী (Competitors):** প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানকে ব্যাপক পরিসরে প্রতিযোগিতা মোকাবেলা করতে হয়। প্রতিযোগী হলো যারা সমজাতীয় পণ্য ও সেবা উপস্থাপন এবং বিপণন কার্যক্রম গ্রহণ করে তাদেরকে একে অপরের প্রতিযোগী বলে। বিপণন মতবাদে প্রতিষ্ঠান সফলতার জন্য প্রতিযোগীদের তুলনায় ভালোভাবে ভোক্তার অভাব পূরণ তথা সন্তুষ্টি প্রদান করে। একারণে বিপণনকারীকে প্রতিযোগীদের সবলতা, দুর্বলতা ও সামর্থ্য সম্পর্কে পূর্বানুমান করে সুবিধাজনক অবস্থান অর্জন করতে হয় এবং প্রতিযোগিতার তুলনায় শক্তিশালী অবস্থান গ্রহণ করতে হয়।

৬. **জনগোষ্ঠী (Public):** জনগোষ্ঠী হচ্ছে যে কোনো দল বা গোষ্ঠী যারা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে আগ্রহ দেখিয়ে থাকে। প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অর্জনে সংগঠনের সামর্থ্যের ওপর জনগোষ্ঠীর প্রকৃত প্রভাব থাকে অথবা প্রভাব বিস্তারের সম্ভাবনা থাকে। একারণে প্রতিষ্ঠানকে সচেতন জনগোষ্ঠীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করতে হয়। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান সাত ধরনের জনগোষ্ঠী দ্বারা পরিবেষ্টিত; তারা হলো - অর্থসংস্থান জনগোষ্ঠী, গণমাধ্যম জনগোষ্ঠী, সরকারি জনগোষ্ঠী, নাগরিক কার্যক্রম জনগোষ্ঠী, স্থানীয় জনগোষ্ঠী, সাধারণ জনগোষ্ঠী এবং অভ্যন্তরীণ জনগোষ্ঠী।

খ) সামষ্টিক বিপণন পরিবেশ

Macro-Marketing Environment

প্রতিষ্ঠানের বাইরে বৃহত্তর পরিমণ্ডলে যে সকল উপাদান, শক্তি বা উপাদান পণ্য বা সেবা বিপণনে পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে তাকে সামষ্টিক বিপণন পরিবেশ বলে। এই সকল উপাদান প্রতিষ্ঠানের পক্ষে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না বরং এ সকল উপাদান দ্বারা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম প্রভাবিত হয়। সে কারণে বিপণনকারীকে সামষ্টিক পরিবেশের উপাদানগুলোর সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হয়। সামষ্টিক পরিবেশের উপাদানগুলো থেকে প্রতিষ্ঠানের জন্য সুযোগ এবং ঝুঁকি সৃষ্টি হয়। ফলে প্রতিষ্ঠানকে সবসময়ই এ সকল শক্তির প্রতি নজর রাখতে হয় এবং পরিবেশ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।

১. **জনসংখ্যাগত পরিবেশ (Demographic Environment):** পরিবেশের একটা অন্যতম উপাদান হিসেবে জনসংখ্যা বিপণনের কার্যক্রমের উপর প্রভাব ফেলে। কোন একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের জনসংখ্যার আয়তন, ঘনত্ব, অবস্থান, গতিশীলতার ধারা, বয়স, বর্ণ, পেশা ইত্যাদি উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত অবস্থাই জনসংখ্যা পরিবেশ। জনসংখ্যা পরিবেশ বিপণনকারীর কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কারণ এর সাথে জনগণ জড়িত এবং জনগণ বাজার সৃষ্টি করে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের জনসংখ্যার পরিমাণ, ধর্মের পার্থক্য, জীবন ধরনের পদ্ধতির পার্থক্যের কারণে

জনগণের ভোগের পরিমান, ক্রয়, অভ্যাস, রুচি ইত্যাদিতে পার্থক্য সৃষ্টি করে। একারণে বিপণনকারীকে জনসংখ্যাগত পরিবেশ সম্পর্কে জানা প্রয়োজন।

২. **অর্থনৈতিক পরিবেশ (Economic Environment):** পণ্য বিপণনে একটি দেশের অর্থনৈতিক পরিবেশ প্রভাব বিস্তার করে। পণ্যের বিপণনে ক্রেতার অর্থনৈতিক অবস্থা, ভোক্তাদের ক্রয় ক্ষমতা, ব্যয়ের ধরণ প্রভাব বিস্তার করে। যে কোনো পণ্য বিপণনের পূর্বে বিপণনকারীকে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা যেমন- মুদ্রাস্ফীতি, আয়, সঞ্চয়, ঋণের সুবিধা, কর ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা ইত্যাদি সম্পর্কে জেনে নিতে হয়।

৩. **প্রাকৃতিক পরিবেশ (Natural Environment):** কোনো দেশের জলবায়ু, নদ-নদী, আবহাওয়া, প্রাকৃতিক সম্পদ, ইত্যাদির সমন্বয়ে সে দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ গঠিত হয়। এ সকল প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রতিষ্ঠানের বিপণন কার্যাবলিকে প্রভাবিত করে। প্রাকৃতিক পরিবেশ দেশের উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ, জীবনযাত্রা ইত্যাদির ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে থাকে। বিশ্বব্যাপী মানুষ এখন পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন ফলে বিপণনকারীকেও প্রাকৃতিক পরিবেশের বিষয়টি সর্বদা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হয়। প্রাকৃতিক সম্পদের সঠিক ব্যবহার, পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ, পরিবেশবান্ধব সহায়ক কার্যক্রম গ্রহণ, গ্রিণ হাউজ প্রভাব ইত্যাদি সম্পর্কে বিপণনকারীর সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

৪. **প্রযুক্তিগত পরিবেশ (Technological Environment):** প্রযুক্তিগত পরিবেশের মাধ্যমে একদিকে যেমন নতুন পণ্য উদ্ভাবন করা সম্ভব হচ্ছে অন্য দিকে বিপণন কার্যক্রমে নতুন সুযোগ ও হুমকির সৃষ্টি হচ্ছে। প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে নতুন বাজার ও সুযোগ সৃষ্টির ফলে ভোগ ও সেবার বৈচিত্রতা দেখা যায়। প্রযুক্তি মানুষকে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করে দিয়েছে; যেমন- আধুনিক গাড়ি, টেলিভিশন, ক্রেডিট কার্ড এবং সুপার কম্পিউটারের মতো বিষয়সমূহ। প্রযুক্তি পরিবর্তনের ধারাগুলো গুরুত্বের সাথে দৃষ্টি দিয়ে গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে উচ্চ বাজেট রাখা বিপণনকারীর জন্য প্রয়োজন।

৫. **রাজনৈতিক পরিবেশ (Political Environment):** বিপণন কার্যাবলির ওপর প্রভাব সৃষ্টিকারী বিভিন্ন সরকারি সংস্থা এবং সামাজিক স্বার্থ সংরক্ষনকারী সংগঠনগুলোর কার্যক্রমের সমন্বয়ে রাজনৈতিক পরিবেশ গঠিত। রাজনৈতিক এবং আইনগত পরিবেশ দ্বারাও বিপণন কার্যক্রম প্রভাবিত হয়। তাই সরকারি আইনকানুন, রাজনৈতিক দল পদ্ধতি, সরকারি ব্যবস্থার ধরন ইত্যাদি বিষয়গুলোর প্রতি বিপণনকাররীকে নজর দিতে হয়।

৬. **সাংস্কৃতিক পরিবেশ (Cultural Environment):** সাংস্কৃতিক পরিবেশ বলতে সেসব উপাদানকে বোঝায় যা সমাজের মৌলিক মূল্যবোধ, প্রত্যক্ষণ, অগ্রাধিকার এবং আচরণকে প্রভাবিত করে। একটি দেশ বা সমাজের জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ পণ্য উৎপাদনকে যেমন প্রভাবিত করে তেমনি বিপণন কার্যক্রমকেও প্রভাবিত করে। সমাজের সাংস্কৃতিক উপাদানগুলো সম্পর্কে বিপণনকারীকে অবহিত থাকতে হয় এবং সেভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। তাই কোনো এলাকায় বিপণন কার্যক্রম পরিচালনার পূর্বেই সেখানকার সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক চলকসমূহ বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

সারসংক্ষেপ:

নির্দিষ্ট কোনো পণ্য বা সেবা বিপণনে যে সমস্ত বিষয়, পক্ষ বা শক্তিসমূহ পণ্য বা সেবার উপর প্রভাব বিস্তার করে, তাই হলো পণ্যের বিপণন পরিবেশ। ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক দুই ধরনের উপাদান নিয়ে বিপণন পরিবেশ গঠিত। কোনো পণ্য, সেবা বা ধারণা বিপণনে প্রতিষ্ঠানের ভিতরকার বা খুব কাছাকাছি এমন শক্তিগুলো নিয়ে ব্যষ্টিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়। যার মধ্যে রয়েছে কোম্পানি, সরবরাহকারী, মধ্যস্থব্যবসায়ী, ক্রেতা, প্রতিযোগী এবং জনগোষ্ঠী। এই পরিবেশের উপাদানগুলো প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে সরাসরি প্রভাব বিস্তার করে এবং প্রতিষ্ঠান এই উপাদানগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। প্রতিষ্ঠানের বাইরে বৃহত্তর পরিমন্ডলে যে সকল উপাদান, শক্তি বা উপাদান পণ্য বা সেবা বিপণনে পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে তাকে সামষ্টিক বিপণন পরিবেশ বলে। এই সকল উপাদান প্রতিষ্ঠানের পক্ষে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না বরং এই সকল উপাদান দ্বারা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম প্রভাবিত হয়। সামষ্টিক পরিবেশের উপাদানগুলো হলো জনসংখ্যাগত পরিবেশ, অর্থনৈতিক পরিবেশ, প্রাকৃতিক পরিবেশ, প্রযুক্তিগত পরিবেশ, রাজনৈতিক পরিবেশ ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ।

পাঠ-৩.২ বিপণন তথ্য ব্যবস্থা
Marketing Information System

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- বিপণন তথ্য ব্যবস্থা কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- অভ্যন্তরীণ তথ্য সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন;
- বিপণন বুদ্ধিমত্তা কী তা বর্ণনা করতে পারবেন; এবং
- বিপণন গবেষণা সম্পর্কে বলতে পারবেন।

বিপণন তথ্য ব্যবস্থা
Marketing Information System (MIS)

ব্যবসায়ের পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সঠিক পূর্বানুমান করে ব্যবসায়ের পরিকল্পনা ও কৌশল গ্রহণ করা। যে সকল বিপণনকারী যথাযথ ভবিষ্যৎ মূল্যায়ন করার মাধ্যমে ব্যবসায়ে সফলতা লাভ করতে পারে। তাই বলা হয় ব্যবসায়ের সফল ব্যবস্থাপনার মূল কথা হচ্ছে এর ভবিষ্যৎকে ব্যবস্থাপনা করা। আর, তথ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই একটি প্রতিষ্ঠান তার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে পারে। বর্তমানে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ব্যবসায় পরিবেশের সাম্প্রতিক তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবহার করার মাধ্যমে সার্বিক বিপণন কার্যাবলি সম্পাদন করা হয়। ভোক্তা, পণ্য, মূল্য, প্রসার, বণ্টন ইত্যাদি বিপণনের মৌলিক বিষয়সমূহের সকল স্তরের সাথে তথ্য ব্যবস্থাপনা জড়িত। একারণেই বিপণন তথ্য ব্যবস্থা বিপণনকারীর কাজের সাথে সরাসরি জড়িত। বিপণন তথ্য ব্যবস্থা হলো একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের ভেতর এবং বাইরের প্রয়োজনীয় সকল তথ্য সংগ্রহ করে, তথ্য প্রক্রিয়াজাত করে এবং সংরক্ষণের মাধ্যমে বিপণনকারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে। অন্যভাবে বলা যায় যে, প্রয়োজনীয় ব্যক্তি, যন্ত্রপাতি ও প্রক্রিয়া নিয়ে বিপণন তথ্য ব্যবস্থার কাঠামো গঠিত হয়, যা বিপণনকারীকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে। বিপণন তথ্য ব্যবস্থার মাধ্যমে বিপণনকারী তথ্য সংগ্রহ, শ্রেণিকরণ, বিশ্লেষণ এবং মূল্যায়ন করে প্রয়োজনীয়, সময়মতো ও সঠিক তথ্য বণ্টন করতে পারে। সুতরাং, বিপণন তথ্য ব্যবস্থা হচ্ছে পরস্পর ক্রিয়াশীল, চলমান, ভবিষ্যতমুখী প্রাতিষ্ঠানিক বিষয় এবং পদ্ধতিগত কাঠামো যার উদ্দেশ্য হচ্ছে তথ্য প্রবাহ সৃষ্টি, ধারণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের বিপণন কর্মসূচিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা । বিপণন তথ্য ব্যবস্থায় প্রথমেই তথ্যের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করা হয়। এরপর তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও বণ্টনের কাজ করে থাকে যা চিত্র নয় ৩.২ এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

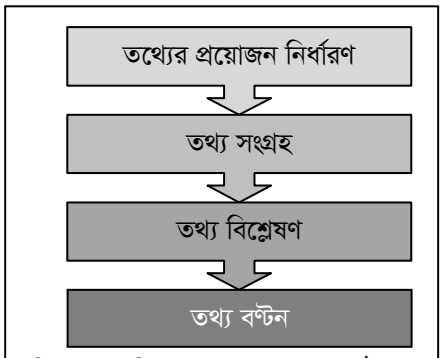

চিত্র ৩.২: বিপণন তথ্য ব্যবস্থার কাঠামো

১. **তথ্যের প্রয়োজন নির্ধারণ (Determination of Information Needs):** প্রথমে নির্ধারণ করা প্রয়োজন যে বিপণনকারী কী তথ্য পেতে চায় এবং কীভাবে তা পেতে চায়। সাধারণ তথ্য এবং গোপনীয় তথ্যের প্রয়োজনীয়তা বিপণনকারীর কাছে ভিন্ন হয়ে থাকে। সাধারণ তথ্য সহজভাবেই বিপণনকারী সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করতে পারে কিন্তু গোপনীয় তথ্য সর্তকতার সাথে সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে থাকে। এছাড়া বিপণনকারী শুধুমাত্র সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য প্রাসঙ্গিক, সাম্প্রতিক, পূর্ণাঙ্গ ও গ্রহণযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করে। সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিপণন ব্যবস্থাপক জানতে পারে কী ধরনের তথ্য তারা পেতে চায়। এ প্রক্রিয়ায় যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে তা নিম্নে দেওয়া হলো:

তথ্য প্রয়োজন নির্ধারণের প্রশ্নাবলি
▪ আপনাকে নিয়মিতভাবে কী ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়?
▪ এ সকল সিদ্ধান্তের জন্য আপনার কী ধরনের তথ্য প্রয়োজন?
▪ কী ধরনের তথ্য আপনি নিয়মিত পেয়ে থাকেন?
▪ কী ধরনের বিশেষ গবেষণা আপনার প্রয়োজন?
▪ আপনি কী ধরনের এমন তথ্য পেতে চান, যা এখন পাচ্ছেন না?
▪ আপনি দৈনিক, মাসিক, বাৎসরিক কী তথ্য পেতে চান?
▪ কোন কোন সাময়িকী, ব্যবসা রিপোর্ট নিয়মিতভাবে দেখতে চান?
▪ কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে আপনি নিয়মিতভাবে অবগত হতে চান?
▪ উপাত্ত বিশ্লেষণের কোন পদ্ধতি আপনি পছন্দ করেন?
▪ বিপণন তথ্য ব্যবস্থার বর্তমান অবস্থাকে উন্নত করে এমন চারটি সুপারিশ করবেন কী?

সারণি ৩.১: বিপণন তথ্য প্রয়োজন নির্ধারণ

২. **তথ্য সংগ্রহ (Colloecting Information):** একটি প্রতিষ্ঠানের বিপণন ব্যবস্থাপক তার তথ্যের প্রয়োজন যদি নির্ধারণ করতে পারেন তারপর যে বিষয়টা তিনি বিবেচনা করেন তা হলো কীভাব সেই প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে পারে। বিপণন ব্যবস্থাপকের প্রয়োজনীয় তথ্য নিম্নলিখিত তিন ভাবে সংগ্রহ করতে পারে:

ক) অভ্যন্তরীণ তথ্য

Internal Records

একটি প্রতিষ্ঠনের অভ্যন্তরে ব্যবসায়িক বিভিন্ন বিষয়ের ওপর তথ্য সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন নথি তৈরি করে। বিপণনকারী নিয়মিতভাবে অভ্যন্তরীণ নথিভুক্ত তথ্য এবং প্রতিবেদন ব্যবহার করে থাকে। যেমন- প্রতিষ্ঠানের হিসাব বিভাগ আর্থিক বিবরণী তৈরি করে থাকে। কিন্তু অর্থ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের জন্য ব্যবস্থাপক প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণ করে থাকেন। আবার, ক্রেতা বা সেবা বিভাগ ক্রেতার সন্তুষ্টি এবং সমস্যা সংক্রান্ত প্রতিবেদন তৈরি করে থাকে। এই বিভাগের ভোক্তা গবেষণার তথ্য ব্যবহার করে প্রতিষ্ঠানের অনেক বিভাগ উপকৃত হয়ে থাকে; যেমন- পণ্য নকশা তৈরি করা বা ব্র্যান্ড প্রস্তুত করা। এ তথ্য কম খরচে সংগ্রহ করা যায় এবং জটিলতার পরিমাণ কম হয়ে থাকে। তবে এ তথ্য কিছু সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। বিভিন্ন বিভাগ তাদের প্রয়োজন এবং দৃষ্টিভঙ্গিতে তথ্য সংগ্রহ করে থাকে। ফলে বিভিন্ন বিভাগের তথ্য সমন্বয় করা ব্যবস্থাপকের জন্য কঠিন হতে পারে। অভ্যন্তরীণ তথ্যের মধ্যে রয়েছে ফরমায়েশ, বিক্রয়, মূল্য, মজুদ পর্যায়, প্রাপ্য বিল, প্রদেয় বিল ইত্যাদি অভ্যন্তরীণ প্রতিবেদন। নিচে অভ্যন্তরীণ নথি পদ্ধতির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসের বর্ণনা দেয়া হলো-

- **ফরমায়েশ পরিশোধ চক্র (Order to Payment Cycle):** এটি অভ্যন্তরীণ রেকর্ড পদ্ধতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বিক্রয় প্রতিনিধি, ডিলার এবং ক্রেতা প্রতিষ্ঠানে তাদের ফরমায়েশ (Order) পেশ করে। এরপর বিক্রয় বিভাগ ফরমায়েশ অনুযায়ী বিভিন্ন বিভাগের জন্য চালান (Invoices) ও প্রেরণ রসিদ (Transmits copeis) প্রস্তুত করে। প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগ এসব পদক্ষেপগুলো দ্রুত ও সঠিকভাবে সম্পাদন করার মাধ্যমে প্রতিশ্রুতি মতো সঠিক সময়ে পণ্য সরবরাহ করতে পারে।

- **বিক্রয় তথ্য পদ্ধতি (Sales Information Systems):** বিপণনকারী চলতি বিক্রয়ের সঠিক প্রতিবেদন সময়মতো পেতে চান। কারণ এর ফলে প্রতিষ্ঠান পরবর্তী ফরমায়েশ গ্রহণ, মজুত পূর্ণকরণ এবং দ্রুত পণ্য প্রেরণের কাজ সম্পাদন করতে পারে। প্রতিষ্ঠান সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বিক্রয় পরিস্থিতি বোঝার জন্য বিক্রয় উপাত্ত অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ব্যাখ্যা করে।

- **ডেটাবেইজ, ডেটা ওয়্যারহাউজ এবং ডেটা মাইনিং (Data Bases, Data Werehouses and Data Mining):** ইন্টারনেট ও প্রযুক্তির কারণে বর্তমানে প্রতিষ্ঠান খুব সহজেই সবধরনের তথ্য ডাটাবেজে ধারণ করতে পারে। প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন তথ্যের ধরন অনুযায়ী তথ্যগুলোকে একসাথে সংরক্ষণ করার নামই হলো ডেটাবেইজ। একটি প্রতিষ্ঠানে সাধারণত ক্রেতা ডেটাবেইজ, পণ্য ডেটাবেইজ, বিক্রয়কর্মী ডেটাবেইজ ইত্যাদি শ্রেণির ডাটাবেইজে থাকে। আবার, ক্রেতা ডাটাবেইজে প্রত্যেকটি ক্রেতার নাম, ঠিকানা, পূর্ববর্তী

লেনদেন বিবরণ, আগ্রহ, মতামত ইত্যাদি তথ্য থাকে। এসব তথ্যের ভিত্তিতে কোম্পানি তার ক্রেতা শ্রেণিকরণ, ক্রেতার প্রয়োজন, অভাব উপলব্ধি করা, ভ্যালু অর্পণ ইত্যাদি বিষয়ে সঠিক পথে কাজ করতে বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। ডেটা ওয়্যারহাইজন হলো একটি পদ্ধতি, যার মাধ্যমে বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ব্যবসায়ের কোনো তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়। আবার, ডেটা মাইনিং হলো এক ধরনের তথ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতি যার মাধ্যমে বিশাল তথ্য ভান্ডার ব্যবহার করে অপ্রকাশিত কিন্তু সঙ্গতিপূর্ণ ও সম্ভাব্য একটি প্যার্টান (Pattern) বা নিদর্শন বের করা হয়। ডাটা মাইনিং তথ্য ভান্ডারের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে সম্পর্কহীন তথ্যের মধ্যে সঙ্গতি বা সম্পর্ক খুঁজে বের করতে পারে।

খ) বিপণন বুদ্ধিমত্তা

Marketing Intelligence

বিপণনকারী বিপণন বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতে পারে যার প্রধান কাজ হচ্ছে বিপণন সংবাদ সংগ্রহ। বিপণন সংবাদ হচ্ছে বিপণন পরিবেশের পরিবর্তনের প্রাত্যহিক তথ্য, যা বিপণনকারীকে বিপণন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সমন্বয়ে সাহায্য করে। বিপণন সংবাদ বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে। প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ব্যক্তি, নির্বাহী, প্রকৌশলী, বিজ্ঞানী, ক্রয়-এজেন্ট এবং বিক্রয়কর্মীদের কাছ থেকে সংবাদ সংগ্রহ করা যেতে পারে। পেশাদারী ও অপেশাদারী দুই ভাবেই বিপণন বুদ্ধিমত্তাকে ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রতিষ্ঠান অনেক সময় পেশাদার তথ্য সরবরাহকারীদের নিকট থেকে তথ্য কিনে থাকে। আবার, অনেক সময় অপেশাদারী সংস্থা অথবা অকাঠামোগত ভাবে তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। বিপণন বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের তথ্য, সংবাদ, ঘটনা ইত্যাদি সংগ্রহ করা হয় কিন্তু এক্ষেত্রে অবশ্যই বৈধ এবং নৈতিকতার বিষয় খেয়াল রাখা প্রয়োজন। প্রতিষ্ঠান বিপণন বুদ্ধিমত্তা উন্নতির লক্ষ্যে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। যেমন-

- বিক্রয় বাহিনীকে প্রশিক্ষণ এবং প্রেষণা দিতে পারে যেন তারা নতুন পরিবর্তন চিহ্নিত করতে পারে ও প্রতিবেদন দিতে পারে।
- প্রতিষ্ঠান তার বণ্টনকারী, খুচরা বিক্রেতা এবং অন্যান্য মধ্যস্থ ব্যবসায়ীদের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদানের জন্য প্রেষণা বা উৎসাহ দিতে পারে।
- প্রতিষ্ঠান তার প্রতিযোগীদের পণ্য কিনে তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। এছাড়াও বাণিজ্য মেলায় গিয়ে প্রতিযোগিতার প্রকাশিত বাণিজ্য প্রতিবেদন পড়ে, শেয়ারহোল্ডারদের সভায় গিয়ে কর্মীদের সাথে আলাপ করে, ডিলার-বণ্টন সরবরাহকারীর সাথে কথা বলে, প্রতিযোগীদের বিজ্ঞাপন দেখে, ইন্টারনেটে প্রতিযোগীদের সংবাদ পড়ে প্রতিষ্ঠান বিপণন তথ্য পেতে পারে।
- প্রতিষ্ঠান প্রতিনিধিত্বকারী ক্রেতা বা কোম্পানির বড় ক্রেতা অথবা, অতি রুচিবান ক্রেতাদের নিয়ে গঠিত ক্রেতা উপদেশ প্যানেল গঠন করে তথ্য জানতে পারে ।
- প্রতিষ্ঠান গবেষণা ফার্মের নিকট থেকে তথ্য ক্রয় করতে পারে।
- অনেক প্রতিষ্ঠান বিপণন তথ্য বিভিন্ন কারণে প্রকাশ করে থাকে তাদের উপাত্ত বিপণনকারী তার নিজস্ব প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারে। এ ধরনের তথ্যের উৎসকে মাধ্যমিক তথ্য উৎস বলে। এখানে মাধ্যমিক উপাত্ত উৎসের কিছু নমুনা দেওয়া হলো -
    - ⇨ সরকারি প্রকাশনা: পরিসংখ্যান প্রতিবেদন, দেশ ও শহরভিত্তিক উপাত্ত বই, শিল্প দৃষ্টিভঙ্গি, বাজারজাতকরণ তথ্য, নির্দেশিকা, অন্যান্য সরকারি প্রকাশনা, বুলেটিন, বর্তমান ব্যবসায় জরিপ রিপোর্ট, প্রধান পরিসংখ্যান প্রতিবেদন।
    - ⇨ সাময়িকী ও বই: ব্যবসায় সাময়িকী সূচি, বিশ্বকোষ (সংস্থার), বিপণন গবেষণা এবং ভোক্তা গবেষণাভিত্তিক সাময়িকী।
    - ⇨ বাণিজ্যিক উপাত্ত: বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, বিমা, কর্পোরেশন, কেন্দ্রীয় ব্যাংক, বাণিজ্যিক তথ্য প্রদানকারী সংস্থা, বাণিজ্যিক গবেষণা সংস্থা ইত্যাদির প্রদানকারী তথ্য বা ম্যাগাজিন বা প্রতিবেদন।

গ) বিপণন গবেষণা

Marketing reseach

বিপণন ব্যবস্থাপক অভ্যন্তরীণ নথি এবং সংবাদ ব্যবস্থার তথ্য দিয়ে তার সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে না। সেক্ষেত্রে বিশেষ সমস্যা সমাধানের জন্য গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। বিপণন ব্যবস্থাপককে তথ্য সরবরাহ করার অন্য একটি মাধ্যম হলো বিপণন গবেষণা। বাজার গবেষণা প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ চিত্র নং ৩.৩ অনুসরণ করে বিপণনকারী যেকোনো বিপণন বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

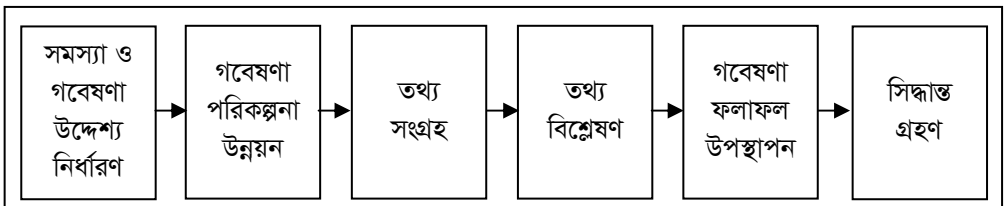

চিত্র ৩.৩: বিপণন গবেষণা প্রক্রিয়ার

১. **সমস্যা এবং গবেষণার উদ্দেশ্য নির্ধারণ (Define the Problem and Research Objectives):** বিপণনের সমস্যা ও গবেষণার উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা প্রয়োজন। উদহারণ হিসেবে বলা যায়, কোনো একটি প্রতিষ্ঠানের পণ্যের বিক্রয় ক্রমাগতভাবে কমে যাচ্ছে। ফলে এর প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানের জন্য বাজার গবেষণা করা যেতে পারে।

২. **গবেষণা পরিকল্পনা উন্নয়ন (Develop the Research Plan):** এই ধাপে কোন তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন এবং কিভাবে এই তথ্য বিভিন্ন উৎস থেকে কোন কৌশল অবলম্বন করে সংগ্রহ করা হবে তার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

৩. **তথ্য সংগ্রহ (Collect the Information):** বিভিন্ন উৎস থেকে প্রয়োজন অনুসারে তথ্য সংগ্রহ করতে হয় এই ধাপে।

৪. **তথ্য বিশ্লেষণ (Analyze the Information):** বিভিন্ন উৎস এবং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করার পর এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে হয়। যেসব তথ্য অপ্রয়োজনীয় এবং কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই সেই সকল তথ্য বাদ দিতে হয়। এতে বিপণন তথ্য গতিশীল হয়।

৫. **গবেষণা ফলাফল উপস্থাপন (Present the Findings):** সঠিক তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণের পর তথ্যগুলো যথাযথভাবে প্রতিবেদন আকারে বা মৌখিকভাবে উপস্থাপন করতে হয় এবং যথাযথ স্থানে পৌঁছে দিতে হয়। যদি তথ্য বিক্রয় সংক্রান্ত হয় তবে বিক্রয় ব্যবস্থাপককে, আর যদি হিসাব সংক্রান্ত হয় তবে হিসাব পরিচালকের নিকট পৌঁছে দিতে হয়।

৬. **সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Make the Decisions):** এইধাপে বিপণনকারী উপস্থাপিত গবেষণা তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

সারসংক্ষেপ:

ব্যবসায়ের পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সঠিক পূর্বানুমান করে ব্যবসায়ের পরিকল্পনা ও কৌশল গ্রহণ করার জন্য প্রতিষ্ঠানকে তথ্য ব্যবস্থাপনার কাজ করতে হয়। বিপণন তথ্য ব্যবস্থা হচ্ছে পরস্পর ক্রিয়াশীল, চলমান, ভবিষ্যতমুখী প্রাতিষ্ঠানিক বিষয় এবং পদ্ধতিগত কাঠামো যার উদ্দেশ্য হচ্ছে তথ্য প্রবাহ সৃষ্টি, ধারণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের বিপণন কর্মসূচিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা । বিপণন তথ্য ব্যবস্থায় প্রথমেই তথ্যের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করা হয়। এরপর তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও বণ্টনের কাজ করে থাকে। বিপণন ব্যবস্থাপকের প্রয়োজনীয় তথ্য তিন ভাবে সংগ্রহ করতে পারে: ক) অভ্যন্তরীণ তথ্য, খ) বিপণন বুদ্ধিমত্তা ও গ) বিপণন গবেষণা।

পাঠ-৩.৩ সামষ্টিক পরিবেশ বিশ্লেষণ
Analyzing Macro-environment

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- সামষ্টিক পরিবেশ বিশ্লেষণ সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

বিপণনে সবসময়ই সামষ্টিক পরিবেশ পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করতে হয় কারণ বিপণন পরিবেশ সবসময়ই পরিবর্তিত হয়। কোনো পণ্য হঠাৎ বাজারে প্রবেশ করে বাজারে তীব্র চাহিদা পূরণ করে অল্প সময়ের মধ্যেই হঠাৎ করে হারিয়ে যেতে পারে; কোনো পণ্য দীর্ঘদিন বাজারে চাহিদা অপরিবর্তিত থাকে, আবার কোনো পণ্য নির্দিষ্ট সময়ে বা সাময়িক সময়ের জন্য বাজারে অবস্থান করতে পারে। পণ্যের চাহিদার এই বিভিন্নতা তৈরি হয় সামষ্টিক পরিবেশের পরিবর্তনের কারণে। এই পরিবর্তনের কারণে নতুন নতুন পণ্যের প্রয়োজন ও চাহিদাও তৈরি হয়ে থাকে।

বিপণনে সামষ্টিক পরিবেশ বিশ্লেষণ
Analyzing Macro-environment in Marketing

একজন সফল বিপণনকারী সামষ্টিক পরিবেশ বিশ্লেষণ করে এখনও সনাক্ত বা পূরণ করা যায়নি, এমন প্রয়োজন ও প্রবণতা বের করে এবং সেই অনুযায়ী লাভজনক বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা করে। নিম্নে কিভাবে সামষ্টিক পরিবেশ বিশ্লেষণ করা হয় তা আলোচনা করা হলো–

১. **জনসংখ্যাগত পরিবেশ (Demographic Environment):** কোন একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের জনসংখ্যার আয়তন, ঘনত্ব, অবস্থান, গতিশীলতার ধারা, বয়স, বর্ণ, পেশা ইত্যাদি উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত অবস্থাই জনসংখ্যা পরিবেশ। জনসংখ্যা পরিবেশ বিপণনকারীর কাছে মূল আগ্রহের বিষয়, কারণ এর সাথে জনগণ জড়িত এবং জনগণ বাজার সৃষ্টি করে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের জনসংখ্যার পরিমান, ধর্মের পার্থক্য, জীবনধরণ পদ্ধতির পার্থক্য প্রভৃতি জনগনের ভোগের পরিমান, ক্রয়, অভ্যাস, রুচি ইত্যাদিতে পার্থক্য সৃষ্টি করে। যে কোন পণ্যের বিপণন করার পূর্বে বিপণনকারীকে জনসংখ্যা সম্পর্কিত যে সকল বিষয় জানা প্রয়োজন বা বিবেচনা করা উচিত তা হলো-

   - জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে অনেক সময় চাহিদা এবং যোগানের মধ্যে সমন্বয় সাধন কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। আবার এ বৃদ্ধি মানুষের জীবনযাত্রার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে তাই বিপণনকারীকে জনসংখ্যাগত পরিবেশ সম্পর্কে জানতে হয়।
   - একটি দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা কতভাগ শিশু, কিশোর, যুবক, বৃদ্ধ ইত্যাদি বিভিন্ন বয়সের শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তা একজন বিপণনকারীকে জানতে হয়। কারণ বিভিন্ন বয়সের জনগণের বিভিন্ন ধরনের চাহিদা রয়েছে।
   - উন্নয়নশীল, উন্নত এবং অনুন্নয়নশীল দেশসমূহে পারিবারিক জীবন ধারায় ভিন্নতা দেখা যায়। কর্মজীবী মহিলার সংখ্যা, বিলম্বে বিবাহ, শিক্ষার প্রসার, স্বাস্থ্য সচেতনা বৃদ্ধি ইত্যাদি প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ায় পারিবারিক জীবন ধারায় পরিবর্তন এসেছে। বিপণনকারী সে তথ্য জেনে তার কৌশল নির্ধারণ করতে পারেন।
   - বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক দূর্যোগ, ব্যবসায়িক এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সুবিধা, জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের সুযোগ ইত্যাদির কারণে মানুষ এক দেশ হতে অন্য দেশে অথবা এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে স্থানান্তরিত হচ্ছে। বিভিন্ন দেশের মধ্যে বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতি পরিলক্ষিত হয়। এ সাংস্কৃতিক

বৈচিত্র্যতা তাদের মনোভাব, বিশ্বাস, মূল্যবোধ ইত্যাদি দ্বারা প্রভাবিত হয়। সেইকারণে বিপণনকারী বিভিন্ন জাতীয়তা বা এলাকার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সংস্কৃতি জেনে কৌশল গ্রহণ করতে পারে।

- সমাজে শিক্ষার হার এবং পেশার বণ্টন সম্পর্কে বিপণনকারীকে অবগত থাকতে হয়। শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত মানুষের সংখ্যা ও তাদের রুচি, চাহিদা ক্রয় ইত্যাদির মধ্যেকার পার্থক্য জানা প্রয়োজন। কারণ বিভিন্ন পেশার মানুষের মধ্যে আচরণগত পার্থক্য দেখা যায় যা বিপণনের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

২. **অর্থনৈতিক পরিবেশ (Economic Environment):** একটি দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মানের দ্বারা সে দেশের অর্থনৈতিক পরিবেশ পরিলক্ষিত হয়। ভোক্তাদের ক্রয় ক্ষমতা এবং ব্যয়ের ধরনকে প্রভাবিত করে এমন সকল উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত অবস্থাই হলো অর্থনৈতিক পরিবেশ। বাজারে শুধুমাত্র পণ্য সরবরাহ করাই বিপণনকারীর প্রধান কাজ নয় বরং বাজারে ক্রেতাদের ক্রয়ক্ষমতা বিবেচনা করে পণ্য সরবরাহ করতে হয়। সুতরাং পণ্যের বিপণনে ক্রেতার অর্থনৈতিক অবস্থাও প্রভাব বিস্তার করে। যে কোন পণ্য বিপণনের পূর্বে বিপণনকারীকে অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে নিম্ন লিখিত বিষয়সমূহ জানতে হয়-

- কোন কোন কারণে ক্রেতার আয়ের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়, তা বিপণনকারীকে জানতে হয়। মাত্রাতিরিক্ত মুদ্রাস্ফীতি, ব্যাপক বেকারত্ব, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা ইত্যাদির কারণে ক্রেতার অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে।
- সময় এবং আয়ের পরিবর্তনের ফলে ভোক্তাদের ভোগের পরিবর্তন হয়ে থাকে। ক্রেতাদের আয়, জীবনযাত্রার মান, সুদের হার, সঞ্চয়, ঋণ ইত্যাদি মানুষের ভোগের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে।
- সঞ্চয়ের প্রবনতা, ঋণের প্রাপ্যতা, বাকিতে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি ভোক্তাদের ক্রয় আচরণকে প্রভাবিত করে। ভোক্তাদের সঞ্চয়ের প্রবণতা বৃদ্ধি পেলে ভোগের পরিমাণ কম হয়। আবার ঋণের সহজ লভ্যতা ভোগের পরিমানকে বৃদ্ধি করতে পারে। সুতরাং জনগণের এ বিষয়সমূহকে বিপণনকারীকে বিবেচনায় নিয়ে আসতে হয়।

৩. **প্রাকৃতিক পরিবেশ (Natural Environment):** কোনো দেশের জলবায়ু, নদ-নদী, আবহাওয়া, প্রাকৃতিক সম্পদ, ইত্যাদির সমন্বয়ে সেই দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ গঠিত হয়। এ সকল প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান প্রতিষ্ঠানের অজান্তেই বিপণন কার্যাবলিকে প্রভাবিত করে। প্রাকৃতিক পরিবেশ কোনো দেশের উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ, জীবনযাত্রা ইত্যাদির ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এ পরিবেশ বিপণনের অনুকূলে এবং প্রতিকূলে কাজ করতে পারে। তাই বিপণনকারীকে প্রাকৃতিক পরিবেশের বিষয়টি সর্বদা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হয়। নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি বিপণনকারীকে গুরুত্ব দিতে হয়-

- পৃথিবীর প্রাপ্ত কাঁচামালসমূহ অসীম নয়। বিশুদ্ধ পানি, বন-জঙ্গল, তেল, খনিজ পণ্য, গ্যাস ইত্যাদির সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তাই কাঁচামালের স্বল্পতা বিপণনে প্রভাবিত করে।
- উৎপাদনসহ ব্যবসায়িক সকল কর্মকান্ডের সাথে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে শক্তি সম্পদ জড়িত থাকে। বিপণনের ক্ষেত্রে উৎপাদন, বণ্টন থেকে শুরু করে এই শক্তি সম্পদ প্রভাব বিস্তার করে। যেমন- তেলের সহজলভ্যতা না থাকলে এর প্রভাব পড়ে সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর। তাই এর বিকল্প হিসাবে সৌর শক্তি এবং পারমানবিক শক্তি ইত্যাদি ব্যবহারের প্রচেষ্টা চলছে।
- বিভিন্ন শিল্পের কার্যক্রমের কারণে প্রাকৃতিক পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। পরিবহন, কলকারখানা থেকে র্নিগত ধোঁয়া পরিবেশকে দূষিত করছে। যার ফলে জনজীবন, জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর প্রভাব বিপণনের কার্যক্রমের উপর প্রভাব বিস্তার করছে।
- সরকার অনেক সময় পরিবেশ দূষণ রোধ ও প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষার জন্য সরাসরি হস্তক্ষেপ করে। সরকারি নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিষ্ঠানের বিপণন কাজে পরিবর্তন সাধিত হয়।

৪. **প্রযুক্তিগত পরিবেশ (Technological Environment):** প্রযুক্তিগত উন্নয়নের মাধ্যমে নিত্যনতুন বৈচিত্র্যময় পণ্য উৎপাদনের করে ব্যবসায়-বাণিজ্যকে সচল থাকে। এর ফলে বিপণন পরিবেশে নতুন সুযোগ ও হুমকির সৃষ্টি হয়। তাই প্রযুক্তিগত বিষয়টি বিশ্লেষণের জন্য বিপণনকারীকে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ রাখতে হয়-

- বর্তমানের প্রযুক্তি পরিবর্তনের ধারা মানুষের জীবনযাত্রার গতিকে পরিবর্তন করে দিয়েছে। যোগাযোগের ক্ষেত্রে ই-মেইল, ইন্টারনেট, ফ্যাক্স, মোবাইল ফোন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তাই প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে পুরাতন পণ্যের চাহিদা লুপ্ত হয়ে নতুন চাহিদার সৃষ্টি হচ্ছে।
- বর্তমানে যে সকল প্রযুক্তি প্রচলিত রয়েছে ভবিষ্যতে আরো উন্নত মানের প্রযুক্তির সৃষ্টি হতে পারে। এর ফলে উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আসতে পারে। এসব আবিষ্কার বিপণনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে পারে।
- প্রতিষ্ঠানকে প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য গবেষণা এবং উন্নয়ন খাতকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা প্রয়োজন হয়। বর্তমানে একক ভাবে গবেষণার পিছনে ব্যয় বৃদ্ধি না করে দলগত ভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

৫. **রাজনৈতিক পরিবেশ (Political Environment):** বিভিন্ন সরকারি সংস্থা এবং সামাজিক স্বার্থ সংরক্ষণকারী সংগঠন বিপণনের কার্যক্রমের ওপর প্রভাব সৃষ্টিকারী করে। তাই সরকারি আইনকানুন, রাজনৈতিক দল পদ্ধতি, সরকারি ব্যবস্থার ধরন ইত্যাদি বিষয়গুলোর প্রতি বিপণনকারীকে নজর দিতে হয়। রাজনৈতিক পরিবেশের নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি বিপণনকারী গুরুত্ব দেয়-

- ব্যবসায় পরিবেশ সুরক্ষার জন্য যেকোনো দেশের প্রচলিত আইন কানুন এবং নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার ভূমিকা রয়েছে। সাধারণত সুস্থ প্রতিযোগিতা, ব্যবসায়িক অসাধুতা থেকে ক্রেতাদের রক্ষা এবং ব্যবসায়িক কার্যক্রমের ক্ষতিকর দিক থেকে সমাজকে রক্ষা করার জন্য ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণকারী আইন ও অধ্যাদেশ জারি করা হয়। বিপণনকারী এসব আইন জেনে তার কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে।
- জনস্বার্থরক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানগুলো ভোক্তাদের অধিকার, নাগরিকের অধিকার, পরিবেশ রক্ষা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার জন্য কঠোর চেষ্টা করছে। ফলে বিপণনকারী এই সকল সংস্থার কার্যক্রমের সাথে সংগতি রেখে বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

৬. **সাংস্কৃতিক পরিবেশ (Cultural Environment):** সাংস্কৃতিক পরিবেশ হলো সমাজের উপাদানসমূহ যা মৌলিক মূল্যবোধ, প্রত্যক্ষণ, অগ্রাধিকার এবং আচরণকে প্রভাবিত করে। এসব উপাদান পণ্য উৎপাদন ও বিপণনকে প্রভাবিত করে। তাই সমাজের সাংস্কৃতিক উপাদানগুলো সম্পর্কে বিপণনকারীকে জানতে হয় এবং সেভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়।

সারসংক্ষেপ:

একজন সফল বিপণনকারী সামষ্টিক পরিবেশ বিশ্লেষণ করে এখনও সনাক্ত বা পূরণ করা যায়নি এমন প্রয়োজন ও প্রবণতা বের করে এবং সেই অনুযায়ী লাভজনক বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা করে। এক্ষেত্রে বিপণনকারী জনসংখ্যাগত, অর্থনৈতিক, প্রাকৃতিক, প্রযুক্তিগত, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ বিশ্লেষণ করে বাজারের পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে পারে।

পাঠ-৩.৪ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদা নির্ধারণ
Estimating Current and Future Demand

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বর্তমান চাহিদা নির্ধারণের পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন; এবং
- ভবিষ্যৎ চাহিদা নির্ধারণ করার পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।

বিপণনকারী বাজার পরিবেশ ও বিপণন গবেষণার মাধ্যমে আকর্ষণীয় বাজার সুযোগকে খুঁজে বের করে। এরপর সেসব নতুন বাজার সুযোগের আকার, আয়তন, বৃদ্ধি ও মুনাফার সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়। বিপণনকারী এইসব তথ্যের ভিত্তিতে বিক্রয়ের পরিমাণ পূর্বানুমান করে বাজার চাহিদা পরিমাপ করে। এরফলে ব্যবসায়ে কতটা বিনিয়োগ করা প্রয়োজন বিপণনকারী সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে । পণ্যের বাজার চাহিদা পরিমাপ ও পূর্বানুমান করার জন্য বর্তমান বাজার ও ভবিষ্যৎ বাজারের চাহিদা পরিমাপ করা হয়।

বর্তমান চাহিদা নির্ধারণ
Estimating Current Demand

প্রতিষ্ঠান বর্তমান চাহিদা নির্ধারণ করার জন্য মোট বাজার সম্ভাব্যতা, এলাকা বাজার সম্ভাব্যতা, বাজার গঠন পদ্ধতি ও বহু উপাদানবিশিষ্ট সূচক পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকে। তা নিম্নে আলোচনা করা হলো-

১. **মোট বাজার সম্ভাব্যতা (Total Market Potential):** মোট বাজার সম্ভাব্যতা বলতে কোনো একটি নির্দিষ্ট শিল্প অর্থাৎ একই পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত সকল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সর্বাধিক কত পরিমাণ বিক্রয় করতে পারে তার মোট পরিমাণকে বোঝায়। মোট বাজার সম্ভাব্যতার পরিমাণ একটি নির্দিষ্ট সময়ে এবং বিরাজমান পরিবেশে সেই শিল্পের প্রয়োগকৃত সকল বিপণন প্রচেষ্টাকে বিবেচনা করে নিরূপণ করা হয়। এটি পরিমাপ করার সবচেয়ে সহজ উপায় হলো সম্ভাব্য বা ভবিষ্যৎ ক্রেতাকে গড় ক্রয়ের পরিমাণ ও মূল্য দিয়ে গুণ করে বের করা হয়। ধরা যাক, বাংলাদেশে ৫,০০,০০০ লোক প্রতি বছর ৫টি করে কলম ক্রয় করে, যার ক্রয়মূল্য ১০ টাকা। তাহলে মোট বাজার সম্ভাব্যতা হবে- ৫,০০,০০০ × ৫ × ১০ = ২৫,০০০,০০০ টাকার। কিন্তু এই হিসাব করা সহজ নয়। কারণ একটি বাজারে কতজন ক্রেতা রয়েছে তা বের করা কঠিন। সাধারণত একটি বাজারের মোট জনসংখ্যা নিয়ে হিসাব শুরু করা হয়। বিপণনকারী এরপর মোট জনসংখ্যার কতজন পণ্য ক্রয় করবে তা বাদ দিয়ে সম্ভাব্য ক্রেতার সংখ্যা বের করে। এইক্ষেত্রে বাংলাদেশের শিশু ও অশিক্ষিত জনগোষ্ঠির সংখ্যা বাদ দিয়ে সম্ভাব্য ক্রেতা ধরা হয়।

২. **আঞ্চলিক বাজার সম্ভাব্যতা (Area Market Potential):** কোনো একটি নির্দিষ্ট পণ্যের বাজার এক এক অঞ্চলে এক এক রকম হয়ে থাকে। যেমন- বাংলাদেশের ঢাকা শহরের জনসংখ্যা, আয়, ভোগ ও সিলেটের থেকে ভিন্ন হবে। আবার, শহরাঞ্চলের মানুষের ক্রেতা আচরণ ও গ্রামীণ অঞ্চলের ক্রেতা আচরণ ভিন্ন হবে। সেকারণে প্রতিষ্ঠানের বিপণন খাতে সম্পদ বিনিয়োগ করার সময় অঞ্চল বা এলাকার ভিন্নতার কথা বিবেচনা করে মোট বাজার পরিমাণ নির্ণয় করা প্রয়োজন হয় নয়তো বিনিয়োগকৃত সম্পদ থেকে প্রতিষ্ঠান সর্বোচ্চ ফলাফল অর্জন করতে পারে না।

   ক) **বাজার গঠন পদ্ধতি (Market-Buildup Method):** বাজার গঠন পদ্ধতিতে প্রতিটি অঞ্চলের বাজারের সম্ভাব্য ক্রেতা ও ক্রয়ের পরিমাণ নির্ধারণের মাধ্যমে আঞ্চলিক বাজারের সম্ভাব্য চাহিদা নির্ণয় করা হয়। এই পদ্ধতিতে শুধুমাত্র একটি উপাদান বিবেচনায় এনে বাজার সম্ভাব্যতা নিরূপন করা হয়।

   খ) **বহু উপাদান বিশিষ্ট সূচক পদ্ধতি (Multiple-Factor Index Method):** এই পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট এলাকার সম্ভাব্য ক্রেতা ও ক্রয়ের পরিমাণের সাথে এর সঙ্গে প্রভাব বিস্তার করতে পারে এমন সব উপাদানকেও বিবেচনায় আনা হয়। যেমন- ক্রেতার ক্রয় আচরণ, মাথাপিছু আয় ইত্যাদি। এইসব উপাদানগুলোর আপেক্ষিক গুরুত্বের ভিত্তিতে সেই অঞ্চলের বাজার চাহিদা পরিমাপ করা হয়।

৩. **প্রতিযোগিদের বিক্রয় ও বাজার অংশ (Competitors' Sales and Market Share):** কোনো বাজারে একাধিক সমজাতীয় প্রতিষ্ঠান একই পণ্য নিয়ে ব্যবসায় কাজে নিয়োজিত থাকে ও প্রতিযোগিতা করে। বিপণনকারীকে সেই বাজারের মোট সম্ভাব্য বিক্রয়ের পরিমাণ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কতটুকু বাজার অংশ ধারণ করে আছে তা জানতে হয়। এই তথ্য জানার মাধ্যমে প্রতিযোগি প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এর সাথে বিপণনকারী সেই বাজারে নিজের অবস্থান নির্ণয় করতে পারে।

ভবিষ্যৎ চাহিদা নির্ধারণ

Estimating Future Demand

বিপণনকারী সাধারণত সামষ্টিক পরিবেশ বিশ্লেষণ করে চাহিদার পূর্বানুমান করে থাকে। ভবিষ্যৎ চাহিদা নিরূপন করার জন্য তিন ধরনের তথ্যের প্রতি খেয়াল করা হয়; সেগুলো হলো মানুষ কী বলে?, কী করে অথবা কী করছে। মানুষ কী বলে এই তথ্য জানার জন্য ক্রেতার অভিপ্রায় জরিপ, বিক্রয়কর্মীর সম্মিলিত মতামত এবং বিশেষজ্ঞ মতামত নেওয়া হয়। বাজার পরীক্ষা পদ্ধতি ও বাজার গবেষণার মাধ্যমে মানুষ কী করে বা তাদের সাড়া সম্পর্কে জানা যায়। সর্বশেষে, অতীত বিক্রয়ের লিখিত বিবরনী বা নথি থেকে ক্রেতার অতীত ক্রয় আচরণ বিশ্লেষণ বা কালীন সারি বিশ্লেষণ অথবা পরিসংখ্যানিক চাহিদা বিশ্লেষণের মাধ্যমে মানুষ কী করছে তা নির্ধারণ করা হয়।

১. **ক্রেতার অভিপ্রায় জরিপ (Survey of Buyers' Intensions):** এই পদ্ধতিতে ক্রেতার ক্রয় সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করে ক্রেতার চাহিদা, পচ্ছন্দ কী জানা হয়। একটি নির্দিষ্ট অবস্থায় ক্রেতার মতামত নিয়ে ভবিষ্যত চাহিদা নির্ধারণ করা হয়। তবে এই কৌশলটি শিল্প পণ্য, দীর্ঘস্থায়ী ভোগ্য পণ্য এবং যেসকল পণ্য ক্রয়ের জন্য দীর্ঘমেয়াদী ও অগ্রিম পরিকল্পনার প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আবার, নতুন পণ্যের কোনো অতীত তথ্য না থাকলে ক্রেতার অভিপ্রায় জরিপ পদ্ধতি কার্যকর।

২. **বিক্রয় কর্মীদের সম্মিলিত মতামত (Composite of Sales Force Opinions):** এই পদ্ধতিতে বিক্রয় কর্মীদের সাথে সম্মিলিত মতামতের ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ বিক্রয় পূর্বানুমান করা হয়। প্রতিষ্ঠানের বিক্রয়কর্মী বর্তমান ও সম্ভাব্য ক্রেতার নিকট কত পরিমাণ বিক্রয় করতে পারবে তা জেনে সকল পরিমাণকে যোগ করে সম্ভাব্য বিক্রয়ের পরিমাণ হিসাব করা হয়।

৩. **বিশেষজ্ঞ মতামত (Expert Opinion):** প্রতিষ্ঠান বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়েও তার পণ্যের ভবিষ্যৎ বিক্রয় পূর্বানুমান করতে পারে। বিশেষজ্ঞ বলতে ডিলার, বণ্টনকারী, সরবরাহকারী, বিপণন উপদেষ্টা এবং ব্যবসায়ী সংস্থা যারা প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণে পারস্পরিক মত বিনিময়ের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ চাহিদা নির্ধারণ করে থাকে। আবার অনেকসময় তারা আলাদাভাবেও পূর্বানুমান করতে পারে। পরে প্রতিষ্ঠানের বিশ্লেষক পুনরায় পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সংশোধন করে প্রতিষ্ঠানের পণ্যের মোট ভবিষ্যৎ চাহিদার পরিমাণ ঠিক করে থাকে।

৪. **অতীত বিক্রয় বিশ্লেষণ (Past-Sales Analysis):** প্রতিষ্ঠান অতীতের বিক্রয়ের উপর ভিত্তি করে চাহিদার পূর্বানুমান করে। এক্ষেত্রে কালীন সারি বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে বিক্রয়ের ধারা (Trend), কালচক্র (Cycle), মৌসুম (Seasonal), ও অনির্ধারিত ঘটনার (Erratic) সাথে বিক্রয়ের সম্পর্ক নির্ণয় করে চাহিদার পূর্বানুমান করা হয়।

৫. **বাজার পরীক্ষা পদ্ধতি (Market-Test Method):** সাধারণত এই পদ্ধতি নতুন কোনো পণ্য বা প্রতিষ্ঠিত কোনো পণ্যের নতুনভাবে বণ্টন বা প্রসার বা মূল্য বিপণন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। ক্রেতারা যখন সচেতনতার সাথে ক্রয় পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারে না অথবা বিশেষজ্ঞদের অনুপস্থিত থাকে তখন বাজার পরীক্ষার মাধ্যমে চাহিদা নিরূপনের কাজ পরিচালনা করা হয়।

সারসংক্ষেপ:

বিপণনকারী বাজার পরিবেশ ও বিপণন গবেষণার মাধ্যমে আকর্ষণীয় বাজার সুযোগকে খুঁজে বের করে। প্রতিষ্ঠান বর্তমান চাহিদা নির্ধারণ করার জন্য মোট বাজার সম্ভাব্যতা, এলাকা বাজার সম্ভাব্যতা, বাজার গঠন পদ্ধতি ও বহু উপাদানবিশিষ্ট সূচক পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকে। ভবিষ্যৎ চাহিদা নিরূপন করার জন্য তিন ধরনের তথ্যের প্রতি খেয়াল করেসেগুলো হলো মানুষ কী বলে?, কী করে অথবা কী করছে।

ইউনিট উত্তর মূল্যায়ন

১. বিপণণ পরিবেশ কী? বিপণনকারীকে কেনো বিপণন পরিবেশ সম্পর্কে জানতে হয়? ব্যাখ্যা করুন।
২. ব্যষ্টিক বিপণন পরিবেশের উপাদানগুলো আলোচনা করুন।
৩. সামষ্টিক বিপণন পরিবেশের উপাদানগুলো বিস্তারিত আলোচনা করুন।
৪. সামষ্টিক বিপণন পরিবেশের সকল উপাদান প্রতিষ্ঠানের পক্ষে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না- উক্তিটি কি সঠিক? আপনার মতামত দিন ও যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে লিখুন।
৫. বিপণন তথ্য ব্যবস্থা কী? বিপণন তথ্য ব্যবস্থার কাঠামো বর্ণনা করুন।
৬. বিপণনকারী কতটি উপায়ে তথ্য সংগ্রহ করতে পারে? আলোচনা করুন।
৭. অভ্যন্তরীণ নথি পদ্ধতির উৎসগুলো বর্ণনা করুন।
৮. বিপণন বুদ্ধিমত্তা কী? প্রতিষ্ঠান বিপণন বুদ্ধিমত্তা উন্নতির জন্য কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে? বর্ণনা করুন।
৯. বিপণন গবেষণার ধাপসমূহ লিখুন।
১০. বিপণনকারী তথ্যের প্রয়োজন কিভাবে নির্ধারণ করতে পারে? আলোচনা করুন।
১১. যে কোন পণ্যের বিপণন করার পূর্বে বিপণনকারীকে জনসংখ্যা সম্পর্কিত যে সকল বিষয় জানা প্রয়োজন- কিভাবে জনসংখ্যাগত পরিবেশ বিশ্লেষণ করা যায় বর্ণনা করুন।
১২. বর্তমান চাহিদা নির্ধারণের পদ্ধতি কয়টি? পদ্ধতিগুলো বিস্তারিত আলোচনা করুন।
১৩. ভবিষ্যৎ চাহিদা নিরূপন করার পদ্ধতিগুলো ব্যাখ্যা করুন।

রেফারেন্স বইসমূহ

- Kotler, P., & Armstrong, G. (2016). *Principles of Marketing* (16 ed.). Pearson Education.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management* (15e ed.). Pearson Education.
- Ramaswamy, N. (2009). *Marketing Management – Global Perspective, Indian Context* (4e ed.). Macmillan Publishers India.
- McCarthy, E. J., Shapiro, S. J., & Perreault, W. D. (1979). *Basic marketing*. Irwin-Dorsey.
- পামেলা, ক.শ. ও আক্তার, ফ. (২০২১), *বিপণন নীতিমালা*. বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়.
- পামেলা, ক.শ. ও মাহফুজ, ম.আ. (২০১৯), *বিপণন ব্যবস্থাপনা*. বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়.
- রেজা, ম.স. ও পারভেজ, ম.ম. (২০০৮) *বাজারজাতকরণ নীতিমালা*. বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়.